ভারতের কারাগারে দিনগুলো

মূল
ইফতিখার গিলানি

রূপান্তর
বিনতে আফজাল

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

ভারতের কারাগারে দিনগুলো

প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০২১
প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Bharoter Karagare Dingulo by Iftikhar Gilani
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN : 978-984-95578-6-9

সূচিপত্র

- ভূমিকা..... ৭
- স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার..... ১৪
- তারা আমার খোঁজে এসেছিল ২০
- ধোঁয়া ও আয়নাগুলো..... ৩৪
- তিহারের জীবন..... ৫০
- মোচড় এবং বাঁক ১০৩
- মিডিয়ার ভূমিকা..... ১২৫
- আইন ও তার অপব্যবহার ১৩৭

উৎসর্গ

তাদের জন্য, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জীবন এবং স্বাধীনতা—সমাজ, রাষ্ট্র বা সংবিধান প্রদত্ত উপহার নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতার অগ্নিশিখা ততদিন পর্যন্ত জ্বলবে যতদিন এমন মানুষ আছে যারা তাদের সাহস, দৃঢ়তা আর দূরদর্শিতা দিয়ে ঐসব ব্যাপারগুলোকে প্রকাশ এবং প্রতিহত করে যেগুলো সুবিধার নামে স্বাধীনতাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

ভূমিকা

এরপর যদি একজন মন্ত্রী বা রাজনীতিবিদ, একজন পুলিশ বা সৈনিক, একজন আমলা বা বিচারক এমনকি একজন সাংবাদিক যদি বলে যে, সে আইনের শাসনকে গ্রাহ্য করে তবে আমি দুটি শব্দ উচ্চারণ করব: ইফতিখার গিলানি।

যে বেদনাদায়ক গল্প এ বইতে রয়েছে তা শুধু ক্ষমতার খামখেয়ালিপনা আর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ নয়, নয় ভারতীয় রাষ্ট্রের নিছক অনৈতিকতার ভয়ঙ্কর উপাখ্যান। কীভাবে সমাজের তথাকথিত স্তম্ভগুলো—চতুর্থ স্তম্ভের[১] সাথে একজোট হয়ে সুস্পষ্ট অবিচার নিয়ে আসে তার একটি হতাশাজনক চিত্র।

সাত মাসের জন্য, ইফতিখার—জম্মুভিত্তিক দৈনিক কাশ্মীর টাইমস এর দিল্লিস্থ দপ্তরের প্রধান এবং রাজধানীর একজন সম্মানিত সাংবাদিক যিনি ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট (ওসএ) নামক কঠোর আইনের আওতায় জামিনবিহীন বন্দি ছিলেন।

তার অপরাধ ছিল ভারত শাসিত কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাতিল তথ্য রাখা যেটা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একটি পাকিস্তানি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রচারিত বিবরণীগ্রন্থ থেকে।

এখানে এসে বেশিরভাগ পাঠক ভাববেন আমি এখানে কোনো ভুল করেছি। কেন ভারতীয় সরকার এমন কাউকে বন্দি করতে ওএসএকে প্ররোচিত করবে যার কাছে পাকিস্তানের বাতিল করে দেয়া তথ্য আছে? উত্তর হচ্ছে: আমরা সত্যিই জানি না কেন? তাহলে কি অভিযোগ দায়েরকারী ইনটেলিজেন্স কর্মকর্তারা বোকা ছিল? হতে পারে। তারা কি ইফতিখারের গায়ে কোন অপরাধ গাঁথতে চাইছিল, কতটা হাস্যকর তা জেনেও? হতে পারে। তারা কি এটা ভেবে আত্মবিশ্বাসী ছিল যে একটা ভয়ঙ্কর প্রতারককে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে? প্রায় নিশ্চিতভাবেই, কারণ তারা জানত যে রাষ্ট্রের সকল শাখার কর্মী ও কর্মকর্তারা তাদের এ কাজে সহায়তা করবে এবং এটাও জানত যে তাদের উপরওয়ালারারা—যাদের আদেশ সম্ভবত তারা মেনে চলছে তারা কখনোই এই

১. সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ।

বিদ্বেষপরায়ণ কাজ করাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে দেবে না।

তার পেছনে লাগা নীচ লোকদের নীচ হিসেব যাইহোক না কেন, এই বইয়ের ঘটনার বিবরণী থেকে আমরা এখন জেনে গেছি যে সাত মাসের ভেতর তিহার কারাগারে যখন ইফতিখারের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জানতেন যে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবুও, এই দেশের 'জাতীয় নিরাপত্তা' রক্ষায় নিয়োজিত থাকা রাজনীতিবিদ আর কর্মকর্তারা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গরাদের পেছনে রাখার চেষ্টায় ছিল।

৯ জুন ২০০২ এ জিম্মায় নেবার পর ইফতিখার অবশেষে ১৩ জানুয়ারি ২০০৩—এ মুক্ত হন, তার বিরুদ্ধে করা অসংলগ্নতা আর বৈপরীত্যে ভরপুর মামলাটি যখন নিজের ভার নিজেই বইতে পারছিল না। এমনকি এটাও হয়তো ঘটত না কিন্তু ঘটেছে একদল দক্ষ ও অটল সাংবাদিকের কল্যাণে যারা ইফতিখারের মামলাটি লড়েছিল, তীক্ষ্ণভাবে তথ্য জোগাড় করে যেগুলো পরবর্তীতে চালিয়ে যাওয়া মামলা উচ্ছেদে সহায়তা করেছিল, এবং নিয়মিত বিরতিতে মন্ত্রী ও সম্পাদকদের ক্রমাগত জ্বালাতন করে, ক্রমাগত আবেদন দাখিল করে তার কারাভোগের কলঙ্ক ও দুর্ব্যবহারের বিষয়টিকে চলমান সমস্যা বানিয়ে রেখেছিল।

ইফতিখার এখন একজন মুক্ত মানুষ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার গ্রেফতার ও কারাভোগে বাধ্য করার পেছনের কারণগুলো এখনও চিহ্নিত হয়নি। সব কিছু ছাপিয়ে, তার মামলা সরকারের 'জাতীয় নিরাপত্তা' যন্ত্রের আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে প্রকাশ করে একজন নির্দোষ নাগরিক তৈরি করেছে। ওই ক্ষমতাগুলো রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওএসএ যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু কেউ যদি এটা বিবেচনা করে যে, যেই নিয়ম ইফতিখারকে এর ভেতর নিয়ে এসেছে তারও একটা ব্যবস্থা আছে প্রিভেনশন অব টেরোরিজম অ্যাক্ট হিসেবে (অথবা এর নতুন অবতার দ্য আনলফুল এ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট হিসেবে), অপব্যবহারের সম্ভাবনা প্রায় সীমাহীন।

এখন আমরা জানি যে ইফতিখারকে গ্রেফতারের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তার কম্পিউটারে ভাগ্যক্রমে পাওয়া সন্দেহ জাগানিয়া ফাইলের কারণে নেয়া হয়নি। আইবি কর্মকর্তা তার হার্ড ড্রাইভ ঘেটে 'ভারত শাসিত কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর

তথ্য' শিরোনামে ফাইল পায়। ভারত-শাসিত কাশ্মীর এই পাকিস্তানি শব্দটি জম্মু ও কাশ্মীরের যে অংশটি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নেই সে অংশগুলোকে বোঝায়। জম্মু এবং কাশ্মীর শব্দ দুটি দ্বারা বোঝায় যে এগুলো নেয়া হয়েছে ভারতীয় দাপ্তরিক দলিল থেকে। এর গোপনীয়তার মাত্রা বোঝানোর জন্য তারা আরও যোগ করেছে, 'শুধু উল্লেখ করার জন্য, প্রচার বা প্রকাশ কঠোরভাবে নিষেধ।'

প্রথম ভুলটা ছিল এটাই, যখন আইবি কর্মকর্তারা মনগড়া সাক্ষ্য বানালো। কিন্তু বেরিয়ে আসার মতো আরও অনেক কিছু ছিল। মিলিটারি ইনটেলিজেন্স এর ডিরেক্টরেট জেনারেল (ডিজিএমআই)-কে যখন আইবির পাওয়া সাক্ষ্যের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে বলা হলো, তারা নিজেরাই এর রায় প্রকাশে অনীহা জানাল। যেহেতু এই ফাইলের একটি আসল পাকিস্তানি ফটোকপি বিবরণ তাদের দেয়া হয়েছিল, তাই এটা অজানা থাকার কথা না যে সেখানে কোন মামলা ছিল না আর ইফতিখার নির্দোষ। বস্তুত, যখন ছয় মাস পরে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পুর্নমূল্যায়নের কথা বলা হয় তখন এটাই ছিল মূল্যবান মতামত। কিন্তু জুন মাসে, কিছু কারণে যেগুলো প্রমাণ হওয়া দরকার, ডিজিএমআই আর তার লোকেরা এমন মতামত প্রকাশ করার পক্ষপাতী হয় (পুনরুদ্ধারকৃত তথ্য সরাসারি 'আমাদের বিরোধীতার জন্য দরকারি' হতে পারত) যা মিথ্যা হবে বলেই তারা জানতেন।

যেহেতু প্রকাশিত দলিলে ডিজিএমআইয়ের 'মতামত'-এর কোন উল্লেখ ছিল না, ইফতিখারের আইনজীবীরা বৃথা চেষ্টা চালাল যেন কোর্ট এর বিচারাধিকার নেয় এবং দাবি করল যেন মিলিটারি তাৎক্ষণিকভাবে তার দ্বিতীয় মতামত দেয়। এখানে এসে মামলাটির তৃতীয় ও চতুর্থবারের মতো গতিরোধ হয়, যা ছিল আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় নিরাপত্তা ও সরকারি গোপনীয়তা রক্ষায় মিডিয়া ও নিম্ন বিচারব্যবস্থার জঘন্য রূপ। বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে শুনানি চলাকালে যারা ভুল বিবরণী ও ভুল বিবৃতির দ্বারা ন্যায় বিচারের প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট তৎপরতার সাথে অবমাননাকর আচরণ দেখালেও, উদ্বিগ্ন বিচারক একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ বানোয়াট সংবাদ প্রতিবেদনের, যেটা ইফতিখারকে প্রথমবার কোর্টে উত্থাপনের সময় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। যেখানে ছিল— সোমবারের শুনানির সময় গিলানি প্রতিবেদন অনুযায়ী বলেছেন যে তিনি

আইএসআই-তে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে শ্রেণীবদ্ধ তথ্য পেয়েছেন। যখন প্রধান মহানগর বিচারক সংগীতা সেহগাল জানতে চান যে তিনি তার বিবৃতি রেকর্ড করবেন কিনা, গিলানি সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

খবরটি ছিল মিথ্যা এবং আদালত অবমাননার সামিল। তবুও, কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

দিল্লি পুলিশ স্পেশাল সেলের এই বিবরণ যাকে খাওয়ানো হয়েছিল সেই অপরাধবিষয়ক পত্রিকার প্রতিবেদক কখনোই ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি, যদিও সেই পত্রিকা পরে সংশোধন ও অস্বীকার করে। আমি ২০০৪ সালে এক কলিগের বিয়েতে ঘটনাক্রমে এই সাংবাদিককে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছিলাম এবং আমি যখন বলেছিলাম যে তিনি ইফতিখার গিলানির ব্যাপারে যে চরম কাজটি করেছিলেন সেটা নিয়ে তার সাথে আমার বিতণ্ডা আছে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোন ইফতিখার গিলানিকে চিনি না।' আমার খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে কিছু উপদেশ দেব—'যেসব পুলিশ আপনাকে দিয়ে তাদের গল্পগাথা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা তাদের সুনাম অক্ষত রাখতে পেরেছে। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি যা করেছেন তা ততদিন পর্যন্ত আপনার সুনামে দাগ হয়ে থাকবে যদি আপনি ইফতিখারের কাছে মাফ না চান।'

নিতা শর্মার গল্পগাথা পুলিশের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটা ঠিক সে সময় প্রকাশ পায় যখন ইফতিখারের বন্ধু, অন্যান্য সাংবাদিক এবং আনুহিতা মজুমদারের খসড়াকৃত একটি আবেদন শক্তি যোগাচ্ছিল। ১০ জুন টাইমস অব ইন্ডিয়াতে প্রচারণা নিয়ে একটি ছোট প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো এবং পুলিশ ও আইবি দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করল যে কোনো ধরনের সাংবাদিক সংহতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে হবে। সম্পাদকরা একমত হতো (এবং তারা হয়েছিলও) কিন্তু তাদের প্রচারণার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল ইফতিখারের পুরোপুরি আইএসআই কর্মী হবার সাজানো স্বীকারোক্তি। শীঘ্রই, বাধের মুখ খুলে গেল এবং অনেক ভারতীয় মিডিয়ায় অসংখ্য বিদ্বেষভাজন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া শুরু হলো ইফতিখারকে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং জঙ্গি, চোরাচালানি এবং জিহাদি, একজন যৌনকাতর এবং 'সাংবাদিকের সুবিধা দাবি করা গুপ্তচর',

বলে একসময়ের সাংবাদিক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির এমপি বলবীর.কে. পুনেজর অপমানজনক ভাষায়।

কিন্তু সাংবাদিকরা যদি পেশাদারিত্বের পথ থেকে সরে যাওয়ার মতো ভুল করে থাকে তাদের ভুলটা ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমএইচএ) কর্মকর্তাদের চর্চার থেকে ছোট অপরাধ। যখন ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ডিজিএমআই এর দ্বিতীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, যদি কোনো অপরাধ থেকে ইফতিখারকে অব্যাহতি দেয়াও হয়, এই মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যেকোন মূল্যে একজন নির্দোষ সাংবাদিককে কারাগারে আটক রাখার 'জাতীয়' দায়িত্ব থেকে সরে আসবে না। ইউনিয়ন আইন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সিনিয়র কর্মকর্তা এবং স্পেশাল সেক্রেটারি (জম্মু ও কাশ্মীর বিষয়ক) এ.কে. ভান্ডারির সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় ডিজিএমআই এর ঝামেলাপূর্ণ মতামতকে 'অপ্রাসঙ্গিক' বলে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদিও মিলিটারি ইনটেলিজেন্স এখন স্বীকার করছে যে ইফতিখারের কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত তথ্য প্রণীত হয়েছে পাকিস্তানে, এমএইচএ ধারণা করছে যে একই ব্যক্তি 'দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর', ইফতিখারের বিচার হওয়া উচিত। বস্তুত, ৭ জানুয়ারি ২০০৩ সালে কোর্টে এই ছিল এমএইচএ এর অবস্থান।

এমএইচএ এর অবস্থান দেখে আমি সেদিন মন্ত্রণালয়ের একগিলানিরজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে কথা বলি। মামলাটি নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন, 'তোমরা বলছ একটি প্রকাশিত দলিল আছে? কিন্তু তোমরা ভুলে গেছ এটা পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে।' আমি বললাম, তাহলে এটা কীভাবে বেআইনি হয়? যেকোনো ক্ষেত্রেই, দিল্লির প্রতিরক্ষা অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে এর একটা কপি থাকার কথা। 'তুমি নিশ্চিত?' তিনি পাল্টা আঘাত হানলেন। নিরুদ্যম আলোচনাটি শেষ হলো পরবর্তী সময়ে ইফতিখারের রাজদ্রোহমূলক দলিল সংগ্রহের আরও বিস্তারিত জানানোর অফিসিয়াল প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে। যাহোক, ওইদিন আসার আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শীতল অবস্থা সৃষ্টি করল। কোর্টে ডিজিএমআই এবং এমএইচএ—এর ভেতর চরম অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে, কেউ একজন কোথা থেকে সিদ্ধান্ত নিল, বিচক্ষণতা বাহাদুরির চেয়ে

ভালো। কোনোরকম ব্যাখ্যা বা ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়াই মামলা তুলে নেয়া হলো নীরবে ‘প্রশাসনিক কারণ ও জনস্বার্থে’।

অদ্ভূতভাবে, আমি আগের অনুচ্ছেদে যার কথা উল্লেখ করেছি তার সাথে আমার কাজ শেষ হয়নি। ইফতিখারের মুক্তির পরদিন তিনি আমাকে ফোন করলেন আলোচনার একটা মতামত অংশের সমালোচনা জানানোর জন্য যেটা আমি লিখেছিলাম। ‘তুমি কি জানো তিনি আরও অনেক কিছু করেছিলেন যেগুলো তোমার জানা নেই?’ তিনি বললেন। ‘যেমন?’ আমি জানতে চাইলাম।’ তুমি কি জানো যে তার পাঁচ থেকে ছ’টা পাকিস্তানি ভিসা আছে?’ আলোচনার পরিষ্কারভাবে কোনো দিকে মোড় নিচ্ছিল না তাই আমরা পরে এ বিষয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ফোন রাখলাম, ড্রয়ার খুললাম এবং তিনটি পাকিস্তানি ভিসা গুনলাম। যদি ছয়টা ভিসা ইফতিখারকে সাত মাসের তিহার বাস করাতে পারে তাহলে আমার জন্য কয়মাস হতে পারে? ভাগ্যবশত, নাগরিক মুক্তির জন্য সেই কর্মকর্তা অবসর নিয়েছেন এবং এমএইচএ থেকে বেরিয়ে গেছেন। কম ভাগ্যবশত, তিনি এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান চালাতে সহায়তা করছেন।

একজন ভদ্র, নম্র মানুষ ইফতিখারকে অনেক কষ্ট এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছে এবং তার অক্ষত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি তার গল্প সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এখানে বলেছেন যা সাংবাদিক হিসেবে তার নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এখানে প্রচুর করুণ ও নোংরা হাস্যরস রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইফতিখার সাংবাদিক হিসেবে তার দক্ষতা দিয়ে তার নিজের মামলার তাৎপর্য ও বিশেষত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন আর আমাদের নিয়মের শিকারদের দুর্দশাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। যে গল্প তিনি এখানে বলেছেন তা শুধু তার নিজের গল্প নয়, সেসব দুর্ভাগাদেরও গল্প যারা ওএসএ এর অধীনে যেন তাসের মামলায় আটকে আছে। তাদের গল্প, যাদেরকে আমাদের কারাগারে অত্যাচার করা হয়েছে, মারা হয়েছে। তাদের গল্প, যারা কারাগারের ধর্ষকামী কর্মকর্তাদের অমানবিকতার স্বীকার।

ইফতিখার আমাকে বলেনি কিন্তু এটা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে যে, আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলাদাভাবে দায় নিতে হবে। ইফতিখার কর্তৃক নাম বলা আইবি কর্মকর্তা ছাড়াও আর কে জানত

যে তার কম্পিউটারে দলিলটা ভেবেচিন্তে রাখা আছে? কেইবা প্রথমবার ডিজিএমআই-কে দলিলের ব্যাপারে ফালতু মতামত দেয়ার কথা বোঝাল। মিডিয়াতে মিথ্যা খবর কে ছড়াল? পরিষ্কারভাবে তৎকালীন বাজপেয়ী সরকারের এসব প্রশ্নের উত্তর জানার কোন আগ্রহ ছিল না এবং এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কতটা অপেশাদার এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে তার প্রকৃত স্বরূপ কোনো সরকারই চাইবে না প্রকাশ পাক। কিন্তু কোর্ট একটি ভিন্ন বিষয়। আমি আশা করব প্রত্যেক আসনধারী বিচারক এই বইটি পড়ুক। আমি সর্বোচ্চ কোর্টকে উৎসাহিত করতে চাই যেন এই মামলাটি তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খেয়ালে আনে এবং ক্রিমিনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে নির্দেশ দেয় যাতে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আইনগত কার্যাবলী ছাড়া ভারতীয় প্যানাল কোডের প্রাসঙ্গিক নিয়মে মামলা চালিয়ে যায়। ইফতিখার প্রায় সাত মাস তিহার কারাগারে কাটিয়েছেন। আমি বাজি ধরতে চাই যে এক মাস বা দুই মাস কিংবা তারচেয়ে বেশিদিনের জন্য কোনো নিরপরাধ শিকারকে কারাগারে পাঠানোর আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা দ্বিতীয়বার ভাবে।

ওএসএ সম্বন্ধে বলা যায় এটা একটি ঔপনিবেশিক যুগের আইন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের আইন বইতে যার কোন জায়গা নেই, একে বাতিল বা বহুলাংশে সংশোধন করা দরকার যেন অপব্যবহারের আর কোনো সুযোগ না থাকে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ
দ্য হিন্দুর সহকারী সম্পাদক।[২]

২. সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ বর্তমানে The Wire পত্রিকার সম্পাদক।

এক

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার

১৩ জানুয়ারি ২০০৩, ছ'টা বাজে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে এটা স্বপ্ন নয়। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি সত্যি সত্যি আবারও মুক্ত হচ্ছি। মুক্ত হচ্ছি কারাগার থেকে, অভিযোগ থেকে এবং আশা করা যায় কলঙ্ক থেকে।

আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছিলাম তিহারের তিন নাম্বার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। আমাকে দেওধিতে নেয়া হলো যেখানে আমার মুক্তির সকল আনুষ্ঠানিকতা সারার পর একজন দারোয়ান যান্ত্রিকভাবে জিঙ্গাসা করল, 'আপনার নাম?'

'ইফতিখার গিলানি'

'বাবার নাম? বয়স? শনাক্তকরণ চিহ্ন? সে বলে চলল, তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন।

প্রধান শিক্ষকের অফিসে এক স্কুলবয়ের মতো আমি উত্তর দিয়ে গেলাম। কারাজীবনের সাত মাসের পর ভয় আর আনুগত্য আমার মাঝে সহজাতভাবে চলে এসেছে।

তার কাজ শেষ হবার পর তত্ত্বাবধায়ক আর.পি মীনা এবং তার সহকারী যারা প্রক্রিয়াটা দেখছিল আমাকে বিদায় জানাল।

আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসা হলো বাইরের পৃথিবী আর তিহার কারাগারের রহস্যের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দরজা পর্যন্ত। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম যে এই দরজা আদৌ কখনো আমার জন্য খুলবে কিনা। আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এটা ঘটবে।

একটা ছোট দরজা আমাকে বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে এল। দীর্ঘ সাত মাস ধরে আমি এ মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটা গভীর, কম্পিত শ্বাস নিলাম, এবং তারপর শেষবারের মতো ঘুরে কারাগারের দিকে তাকালাম। ছোট দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এক ভয়ঙ্কর অতীতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যখন আমি মুক্তির সতেজ বাতাসের আস্বাদ নিচ্ছিলাম তখন কাউকে বলতে শুনলাম, 'এই অ্যাম্বুলেন্সে উঠুন, গিলানি।' অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

ব্যক্তিটি ছিলেন একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। তার পাশে আরেকজন কর্মকর্তা ছিলেন। চালক তার জায়গায় ছিলেন আর ইঞ্জিন চলছিল। কী ঘটছে আমি তা বুঝে ওঠার আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির পেছন সিটে ওঠানো হলো, কর্মকর্তা দুজন আমার দুপাশে বসে চালককে যেতে বলল। এমন ব্যাবহারের জন্য আমার হাটুতে বেশ আঘাত লাগল। কিন্তু আমার ব্যাথা আমার ভয়ের তুলনায় কিছুই ছিল না যখন আমি দেখলাম অ্যাম্বুলেন্সটা বন্দিদের মুক্তির জন্য বানানো মূল দরজার দিকে যাচ্ছে না। শীত হলেও আমি ঘামতে শুরু করলাম। সব ধরনের ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মনে ঝড় তুলল। সম্ভবত আমার মুক্তি পরিপূর্ণ নয়। সম্ভবত আমাকে আবার কোনো অভিযোগে গ্রেফতার করা হতে পারে যেমনটা ঘটে থাকে কাশ্মীরের বহু রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে যাদের বন্দিত্ব বাড়তে থাকে একের পর এক অজুহাতে। কী হবে যদি তারা আমাকে কোন ফেইক এনকাউন্টারে ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমার মুক্তির আশা দ্রুত মরে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি কারাগারের কর্মকর্তাদের এ কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলাম না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। মোট কথা তারা বন্দিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয়। তাদের কাজ শুধুমাত্র বন্দিদের আদেশ করা।

হঠাৎ করে একটা মারুতি আর সান্ট্রো গাড়ির উদয় হলো অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে। সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের একজন আতঙ্কিত হয়ে চালককে দ্রুত চালাবার নির্দেশ দিলো। পেছনের গাড়িগুলোও দ্রুত চলতে শুরু করল। তারা যে অ্যাম্বুলেন্সকে ধাওয়া করছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্স আরও দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলে আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানি ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল। সাথে সাথে আমার পেটের ভেতর খালি খালি লাগা শুরু হয়ে গেল। কারাগারের ভেতরের যে অসমান রাস্তাটায় আমাদের গাড়ি চলছিল সেটা মূলত বন্দিদের মৃতদেহ চুপি চুপি কবর দেয়া বা পোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িগুলো কাছাকাছি চলে এসে অ্যাম্বুলেন্সকে ছাড়িয়ে গেল। মারুতির ভেতরের লোকটা অ্যাম্বুলেন্স থামানোর ইঙ্গিত করল। এইবার আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমার জন্য ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করছে। আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। কারাগারের ভেতর অনেকবার আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে আমার মুক্তি আসন্ন, আমার জামিন হয়ে যাবে আর শুনানির পরদিনই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। প্রতিবার আমি পেয়েছি বিচারের দীর্ঘসূত্রতা।